

লেখাপড়ায় আগ্রহী হয়ে উঠছে পাহাড়ী শিশু

নাইক্ষ্যংছড়ির একাধিক গ্রামে স্কুল নেই

এইচএম এরশাদ, কক্সবাজার। বান্দরবান জেলার দক্ষিণ-পূর্বে মিয়ানমার সীমান্ত ঘেঁষে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার একাধিক গ্রামে এখনও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত না হলেও শিশু স্কুল থেকে কোমলমতি শিশুরা শিক্ষাগ্রহণ করে চলছে। এতে অনেক শিশু বই-খাতা হাতে নিয়ে প্রতিদিন ছুটছে স্কুলের দিকে। নাইক্ষ্যংছড়ি-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী চাকঢালা ও আশারতলী এলাকায় ঝরে পড়া শিশুদের বর্তমানে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিচ্ছে কোডেক কর্তৃপক্ষ। সেড দ্য চিলড্রেনের কারিগরি সহযোগিতায় ও বেসরকারী সংস্থা কোডেকের বাস্তবায়নে নাইক্ষ্যংছড়ির দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৩২টি শিশু স্কুল ও শিশু কেন্দ্র। চাকঢালা সীমান্তের বড় ছনখোলা 'শিশু' নামের শিশুশিক্ষা স্কুলে আলাপকালে শিশুদের কেউ বলল ডাক্তার হবে, কেউবা আদর্শ শিক্ষক। কেউ আবার বড় সরকারী অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। বড় ছনখোলা শিশু স্কুলের শিক্ষক সেলিনা আক্তার ও বিদ্যালয়ের সভাপতি এনামুল হক বলেন, পরিবার এবং সমাজের নানা প্রতিকূলতার কারণে ওসব ছেলেমেয়ে লেখাপড়া চালিয়ে নিতে পারেনি। এদের পুনরায় বিদ্যালয়ে এনে মানসম্মত শিক্ষা দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে নেয়াই এ স্কুলের অন্যতম লক্ষ্য। তারা বলেন, এখানে শিশুদের আনন্দের মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানো হয়। স্কুলে বসেই তারা নিজ নিজ পড়া শিখে ফেলে। পাঠদান প্রতিরায় রয়েছে বিশেষ কৌশল। শিক্ষার্থীরা স্কুলে ছোট-বড় দলে পড়াশোনা করে জ্ঞান আহরণ করে। লেখাপড়ার পাশাপাশি এরা সঙ্গীত, সাহিত্য, ছবি আঁকা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে বহুমুখী জ্ঞান অর্জন করে। শিশুদের স্কুলে আসতে উৎসাহিত করা হয়। এছাড়া প্রতিটি সরকারী ও জাতীয় দিবসগুলো পালন করা হয় যথাযথভাবে। স্থানীয়রা জানায়, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের দুর্গম পাহাড়ী এলাকা ঠান্ডাকিরি, মাঝেরচরা ও বড় ছনখোলা। এসব গ্রামে নেই কোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের শিশুদের শিক্ষাগ্রহণ করতে

যেতে হয় দুই থেকে চার কিলোমিটার দূরে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। হাঁটতে হয় দুর্গম পাহাড়ী পথ। এতে নানা কারণে ও আর্থিক অনটনের সংসারে প্রাথমিক বিদ্যালয় জীবন শেষ করার আগেই লেখাপড়া বন্ধ করে কাজে যোগ দেয় অনেক শিশু। দরিদ্র অভিভাবকদের অসচেতনতায় পাহাড়ী অঞ্চলের বহু শিশু এক সময় লেখাপড়া ছেড়ে কাজে যোগ দেয়। লেখাপড়া করার চেয়ে নগদ রোজগারটাই অভিভাবকদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। তবে এখন তারা লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়েছে।

যেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর
সংখ্যা সমান

সাজেদ রহমান, যশোর থেকে জানান, বাঘারপাড়ার ছোটখুদা এইচএম আলিম মাদ্রাসা। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণীতে কোন ছাত্রছাত্রী নেই। অথচ অধ্যক্ষসহ সাত শিক্ষক নিয়মিত সরকারী বেতন তুলছে। অন্যান্য ক্লাসেও একই অবস্থা। অধিকাংশ দিন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সমান সমান উপস্থিত হয়। কোন কোন দিন শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিত হয় কম। অথচ প্রতি মাসে সরকারীভাবে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন বাবদ ব্যয় হয় ৬ লাখ টাকা। এতে খাজনার চেয়ে বাজনাই হচ্ছে বেশি। জানা গেছে, বাঘারপাড়া উপজেলার জহরপুর ইউনিয়নের ছোটখুদা আব্দুল হাই সিদ্দিকীয়া আলিম মাদ্রাসাটি প্রথম দিকে সুনামের সঙ্গে পরিচালিত হয়ে আসছিল। যার কারণে অল্প দিনেই দাখিল থেকে আলিম মাদ্রাসার স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে। বন্ধের পথে স্বীকৃতি ও নবায়ন কার্যক্রম। শিক্ষক ও কর্মচারীদের মাঝে চলছে চরম বিরোধ। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির এত নাজুক অবস্থা যে, প্রথম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৫-৩৫। বিপরীতে শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ২৪। মাদ্রাসা বোর্ডের নিয়মানুযায়ী প্রতি ক্লাসে ৩৬ শিক্ষার্থী ভর্তি থাকবে ও ২৫ শিক্ষার্থী দাখিল

পরীক্ষায় পাস থাকতে হবে। এ ছাড়া আলিম পরীক্ষায় কমপক্ষে ১০ শিক্ষার্থীর পাস থাকতে হবে। অথচ এ প্রতিষ্ঠানে ২০১৩ সালে দাখিলে পাস ছয়জন, আলিমে পাস সাতজন।

শতভাগ পাস করলেও
জরাজীর্ণ ভবনে ক্লাস

স্টাফ রিপোর্টার, বাগেরহাট থেকে জানান, রামপাল উপজেলার বাইনতলা কাশিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবকাঠামোর অভাবের মধ্যেও শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গর্বিত শিক্ষক ও অভিভাবকরা। গত সাত বছর ধরে টানা পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ পাসের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। তবুও সংশ্লিষ্ট দফতরের নজরে আসেনি বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নের দিকে। ১৯৫১ সালে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা লাভের পর শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন হওয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা খুশি হলেও তারা এর সুনাম ধরে রাখার জন্য বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নের দাবি জানান। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানান, দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ও অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ায় তারা হতাশায় ছিলেন। কিন্তু ২০০৭ সালে তাপস চন্দ্র পাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে। এরপর থেকে তার কর্মদক্ষতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ২০০৮ সাল থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ পাসের সাফল্য অর্জন করতে থাকে। এই সাত বছরে মধ্যে দুবার রামপাল উপজেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় এবং প্রধান শিক্ষক তাপস চন্দ্র পাল শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন। তবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন হলেও বিদ্যালয়ের অবকাঠামোর কোন উন্নয়ন হয়নি। বর্তমান বিদ্যালয়ের পুরনো ভবনটি জরাজীর্ণ হওয়া জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার প্রয়োজন।